হেলথ এজেন্ট ট্রেনিং মডিউল

আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি

ভূমিকা

১৯৯৪-১৯৯৫ সালে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির যাত্রা শুরু। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইডিএফ স্বাস্থ্যসেবার কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে আইডিএফ হেলথ প্রোগ্রাম ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের মোট ১১৭ টি উপজেলায় কমিউনিটি পর্যায়ে শুধু মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি অভিজ্ঞ ডাক্তার, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ও হেলথ এজেন্টগণ এর সমন্বয়ে একটি দক্ষ টিম টেলিমেডিসিন সেবাও প্রদান করছে। তবে, ডাক্তার ও মেডিকেল এসিস্ট্যান্টগণ একাডেমিক ডিগ্রীধারি হলেও হেলথ এজেন্ট নির্বাচন করা হয় কমিউনিটি থেকেই। কমিউনিটির মাধ্যমিক /উচ্চ মাধ্যমিক পাশ মেয়েদের থেকেই হেলথ এজেন্ট নির্বাচন করা হয়। এই হেলথ এজেন্টগণ যাতে কাউন্সেলিং, রক্তচাপ পরিমাপ, ডায়বেটিস পরিক্ষা ও টেলিহেলথ এর মাধ্যমে মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ও এম.বি.বি.এস ডাক্তারদের সেবা কমিউনিটি পর্যায়ের লোকদের নিকট সহজে সুন্দরভাবে পৌঁছে দিতে পারে তার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণের মান আরও উন্নত ও কার্যকর করার লক্ষে খুব সহজ বাংলায় এই হেলথ এজেন্ট ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করি এই ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের পর হেলথ এজেন্টগণ আরও দক্ষতার সাথে নিজ এলাকার রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারবেন।

জনাব জহিরুল আলম

নির্বাহী পরিচালক

আইডিএফ

সূচিপত্র

বিষয়---পৃষ্ঠা

কিশোরীদের মাসিক চলাকালীন করণীয়--৩

সাদাস্রাব বা লিউকোরিয়া--৪

গর্ভবতী মায়ের যত্ন--৫

শিশুদের নিউমোনিয়া--৭

সর্দি-কাশি-জ্বর--৮

ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা---১০

পেট ব্যথা--১২

পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টি---১৩

ডায়াবেটিস--১৫

বুকে ব্যথা---১৫

নিম্ন রক্তচাপ---১৬

উচ্চ রক্তচাপ---১৮

মাইগ্রেন/মাথাব্যথা--২০

আরথ্রাইটিস(বাত)--২১

ইলেকট্রিক শক--২৩

অ্যালার্জি--২৪

ত্বকে র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি---২৪

চোখে ছানি--২৫

কৃমি--২৬

জলাতঙ্ক রোগ ও সচেতনতা--২৭

সাপে কাটলে করণীয়--২৮

পানিতে ডুবে গেলে করনীয়---৩০

কিশোরীদের মাসিক চলাকালীন করণীয়

১) মাসিক মেয়েদের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই এসময় কোন প্রয়োজন হলে মা-বাবা ও পরিবারের অন্য নারী সদস্যদের সাথে আলাপ করতে হবে।

২) মাসিক চলাকালীন সময় পরিবারের সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩) মাসিকের সময় স্যানিটারি ন্যাপকিন (প্যাড) বা পরিষ্কার কাপড় ব্যাবহার করতে হবে। প্যাড বা কাপড় ভিজে গেলে তা পাল্টে নতুন প্যাড বা পরিষ্কার কাপড় পরতে হবে। কীভাবে ব্যাবহার করবে তা প্রয়োজনে মা বা অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

৪) যেকোনো ওষুধের দোকানে স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাড কিনতে পাওয়া যায়। প্যাড কিনতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

৫) ব্যাবহৃত প্যাড বা কাপড় যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না। এতে পরিবেশ নোংরা হবে।

৬) ব্যবহৃত প্যাড বা কাপড় কাগজে মুড়িয়ে ময়লা/আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। অথবা গর্ত করে মাটির নিচেও পুতে রাখা যেতে পারে।

৭) মাসিকের সময় ব্যবহার করা কাপড় ধুয়ে আবার ব্যবহার করা যাবে। তবে ব্যাবহৃত কাপড় অপরিষ্কার বা নোংরা পানিতে ধোয়া যাবে না। নোংরা পানিতে অনেক রোগ জীবাণু থাকে। নোংরা পানিতে ধোয়া কাপড় ব্যাবহার করলে বিভিন্ন ধরনের রোগ হওয়ার ভয় থাকে।

৮) মাসিকের সময় ব্যাবহৃত কাপড় সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালো ভাবে ধুতে হবে। সম্ভব হলে, ডেটল বা স্যাভলন দিয়ে ধোয়া ভালো। এতে করে রোগ জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে না।

৯) মাসিকের কাপড় অন্ধকার এবং স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় শুকাতে দেওয়া যাবে না। এসব জায়গায় মাসিকের কাপড় শুকাতে দিলে তাতে রোগজীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে।

১০) ধোয়া কাপড় পরিষ্কার জায়গায় রোদে দিয়ে ভালো ভাবে শুকাতে হবে। এরপর নিরাপদ জায়গায় তা সংরক্ষন করতে হবে।

১১) মাসিক চলাকালে মেয়েদের শরীর থেকে রক্ত বেড়ীয়ে যায়। তাই সবধরনের পুষ্টিকর খাবার যেমন দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, শাকসবজি, ফলমূল খেতে হবে এবং অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশী খাবার খেতে হবে।

১২) মাসিকের সময় তলপেটে ব্যাথা হওয়া স্বাভাবিক। প্রয়োজনে বোতলে গরম পানি ভরে স্যাক দিলে আরাম পাওয়া যায়।

১৩) মাসিকের সময় অতিরিক্ত ব্যাথা বা রক্তক্ষরণ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

১৪) এসময় মেয়েদেরকে স্বাভাবিক সবরকমের কাজকর্ম যেমন, স্কুলে যাওয়া, ঘরের কাজ করা, খেলাধুলা করা ইত্যাদি করতে হবে। তবে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হবে।

১৫) মাসিকের সময় উপরের ব্যায়ামগুলি করলে শরীর ও মন ভালো থাকবে।

<u>সাদা স্রাব বা লিউকোরিয়া</u>

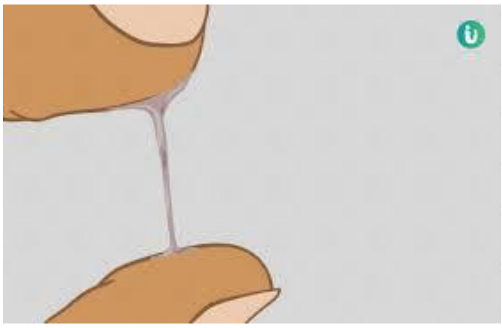

নারীর বিব্রতকর সংক্রমণ

- যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এ ধরনের সংক্রমণ এড়ানো যায়।
- সংক্রমিত হলে বিব্রত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- কোনো প্রসাধনসামগ্রীতে অ্যালার্জি হচ্ছে কি না, লক্ষ করুন।

লিউকোরিয়া বা সাদা পদার্থ নিঃসরণ আর সংক্রমণ এক সমস্যা নয়। কারণ, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমণ ছাড়াও লিউকোরিয়া হতে পারে। তবে সাদা পদার্থের নিঃসরণ অনেক বেশি হলে, ঘোলাটে বা হলদে রং, দুর্গন্ধযুক্ত কিংবা এর সঙ্গে লাল ক্ষত বা চুলকানি থাকলে সংক্রমণ ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। অনেকেই এ নিয়ে চিকিৎসা নিতে বিব্রত বোধ করেন। কিন্তু চিকিৎসা না করলে জটিলতা বাড়তে পারে। গনোকক্কাস ও ট্রাইকোমোনাস জীবাণু সংক্রামক। তাই এই জীবাণুর সংক্রমণে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই চিকিৎসা নিতে হবে।

প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

অনেকের ধারণা, এ ধরনের সংক্রমণে স্বাস্থ্য ভেঙে যায় বা ওজন কমে যায়। শরীর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এটি নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, লিউকোরিয়া কোনো রোগ নয়, রোগের লক্ষণ। তবে এটা সত্য যে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে গেলে ছত্রাকজাতীয় সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। তাই অপুষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য বা ডায়াবেটিসের রোগীদের এ ধরনের সংক্রমণ বেশি হয়। গর্ভাবস্থায়ও অনেকের এ ধরনের সংক্রমণ হতে পারে।

চিকিৎসা

- যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এ ধরনের সংক্রমণ এড়ানো যায়।
- সংক্রমণ হয়ে গেলে বিব্রত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এ ক্ষেত্রে সংক্রমণের ধরন অনুযায়ী চিকিৎসক ঠিক করবেন মলম ব্যবহার করতে হবে, নাকি ওষুধ সেবন করতে হবে।
- ডায়াবেটিস আছে কি না, পরীক্ষা করে নিন।
- সুতি অন্তর্বাস ব্যবহার করুন।
- কোনো প্রসাধনসামগ্রীতে অ্যালার্জি হচ্ছে কি না, লক্ষ করুন।

গর্ভবতী মায়ের যত্ন

মা শুধু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ডাক বা অনুভূতিই নয়, মাতৃত্ব একজন নারীর সবচেয়ে বড় সার্থকতা। কিন্তু একজন নারী যখন প্রথমবার গর্ভধারণ করেন তখন অনেক কিছুই তার অজানা থাকে। তাই সন্তান ধারণ থেকে শুরু করে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত একজন মা'কে অনেক বিষয়ে সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করতে হয়। এ সময় মায়ের বিশেষ যত্নের বিকল্প নেই। অন্তঃসত্ত্বা মায়ের শুধু শারীরিক যত্নই নয়, এ সময় চাই মানসিক সুস্থতাও।চলুন গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও নিরাপদ মাতৃত্ব সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

কখন ও কতবার চিকিৎসকের কাছে যাবেন?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীকে অবশ্যই কমপক্ষে চারবার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। এই চারবার হচ্ছে যথাক্রমে ১৬, ২৮, ৩২ ও ৩৬ সপ্তাহে। প্রসূতিকে অবশ্যই একজন চিকিৎসক বা নিদেনপক্ষে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ দাই দিয়ে প্রসব করানো উচিত।

প্রথম তিন মাসে কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?

প্রথম গর্ভধারণের লজ্জা, বমি বমি ভাব, অ্যাসিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। অথচ এই সময়ই বাচ্চার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পূর্ণ রূপ লাভ করে। এ সময় সহমর্মিতার পাশাপাশি বমি বেশি হলে বমিনাশক, অম্লনাশক ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের পাশাপাশি সবুজ শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। এ সময় ছোট কয়েকটি পরীক্ষা, যেমন রক্তের হিমোগ্লোবিন, সুগার ও গ্রুপ করে রাখা উচিত। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে আল্ট্রাসনোগ্রাম করার দরকার নেই।

পরবর্তী তিন মাস কোন বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে?

যাঁদের মাসিক অনিয়মিত, তাঁদের তারিখ নিশ্চিত করার জন্য ১২-১৪ সপ্তাহে এবং যাঁদের কোনো বংশগত বা জন্মগত সমস্যা আছে কিংবা হয়েছে কি না, তা দেখার জন্য ২০-২২ সপ্তাহে আল্ট্রাসনোগ্রাম করতে হবে। যেহেতু গর্ভস্থ শিশুর শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান মায়ের কাছ থেকেই আসে, তাই মায়ের প্রতিদিনের খাদ্য হতে হবে সুষম; যার মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি, ফলমূল ও প্রচুর পানি থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দুপুরে অন্তত দুই ঘণ্টা ও রাতে অন্তত সাত ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে হবে। আগে টিকা দেওয়া না থাকলে গর্ভাবস্থায় পাঁচ ও ছয় মাস শেষ হলে দুটি টিটি টিকা দিতে হবে। গর্ভস্থ শিশুর বাড়ন্ত গঠনের জন্য আয়রন, ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে দিলে ভালো হয়।

শেষ তিন মাস কেন গুরুত্বপূর্ণ?

এ সময় গর্ভের শিশু খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে। এ সময় অনেক গর্ভবতী মায়ের পায়ে পানি আসতে পারে। পেট বড় হওয়ার জন্য মৃদু শ্বাসকষ্ট, অ্যাসিডিটির কষ্ট, স্তন থেকে কিছু তরল পদার্থ নিঃসৃত হতে পারে। এগুলো গর্ভবতী মায়ের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। তাঁকে এসব বুঝিয়ে বলতে হবে।

এই সময়ে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে, এমন কিছু ঘটলে, যেমন অস্বাভাবিক পেট বড় বা ছোট হওয়া, হঠাৎ রক্ত ভাঙা, খুব বেশি জ্বর আসা, রক্তচাপ অতিরিক্ত বেশি হওয়া—এমন পরিস্থিতিতে তাড়াতাড়ি চিকিৎসককে দেখাতে হবে।

এই সময়ে দীর্ঘ ভ্রমণ?

গর্ভকালীন প্রথম তিন মাস ও শেষ তিন মাস দীর্ঘ ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। উঁচু-নিচু পথ কিংবা ঝাঁকির আশঙ্কা আছে, এমন যানবাহনে ভ্রমণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সকালে ও বিকেলে কিছু সময়ের জন্য স্বাস্থ্যকর ও মনোরম পরিবেশে ভ্রমণ গর্ভবতী মায়েদের জন্য ভালো, এতে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকে।

প্রসবকালীন সতর্কতা

মাথা ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ প্রথম দেখা দিলে বা বের হয়ে আসতে চাইলে, প্রসবের সময় ১২ ঘণ্টার বেশি হলে, অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হলে তাড়াতাড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিতে হবে।

প্রসবের পরের প্রথম দুই ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় রক্তক্ষরণ, রক্তচাপ পরীক্ষা এবং ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মাকে বিশ্রাম দিতে হবে। জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে মায়ের কাছে আনতে হবে এবং মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে।

প্রসবের সময় সতর্ক থাকতে হবে বিপদের চিহ্ন সম্পর্কে, যেমন যোনিপথে রক্তপাত, প্রচণ্ড জ্বর, শরীরে খুব বেশি পানি আসা, চোখে ঝাপসা দেখা, অবিরাম বমি, গর্ভকালে বা প্রসবের সময় খিঁচুনি হওয়া। এর একটি চিহ্ন দেখা গেলে এক মুহূর্তও দেরি না করে হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা মায়ের রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী রক্তদাতার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।

গর্ভবতী মায়ের খাদ্য :

প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি নারীর দৈনিক ২১শ' ৬০ কিলো- ক্যালরি খাদ্যের প্রয়োজন হলেও একজন গর্ভবতীর প্রয়োজন হয় তার চেয়ে ৩৫০ কিলো ক্যালরি খাদ্যের। তা না হলে শিশু অপুষ্টিতে ভুগে ও কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মায় যার মৃত্যু আশঙ্কাজনক।

এ সময় আমিষ জাতীয় খাবার, উদ্ভিজ্য চর্বি, যা পূরণে ভোজ্য তৈল, সয়াবিন, সরিষা বাদাম। ক্যালসিয়াম এর চাহিদা পূরণ করতে দুধ, স্টিমড ব্রকোলি, পনির, কম চর্বিযুক্ত ইয়োগট, এককাপ ক্যালসিয়ামযুক্ত অরেঞ্জ জুস বা সয় দুধ বা চার আউন্স ক্যান করা শ্যামন মাছ খেয়ে ক্যালসিয়ামের চাহিদা মেটাতে পারেন।

আয়রন ও ফলিক এসিড যা কাঁচা কলা, কচুশাক, অন্যান্য ঘন সবুজ ও লাল শাক, মাছ, মাংস ও ডিমে রয়েছে।

ভিটামিনের জন্য প্রচুর শাকসবজি, টক, মিষ্টি ফল, জুস খেতে হবে।পানি যা গর্ভস্থ শিশু, পুষ্টির সরবরাহ সঠিক রাখতে এবং শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থসমূহ নিষ্কাষণে সহায়ক। তাই গর্ভবতীকে প্রতিদিন ১৫-২০ গ্লাস পানি পান করতে হবে তবে একবারে ২

গ্লাসের বেশি পানি পান করা যাবে না। শর্করা যা অধিক খেলে শরীরে ওজন বেড়ে যায় তাই আঁশযুক্ত শর্করা যেমন ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত, গমের রুটি ইত্যাদি খাওয়া উচিত।আলু, ও মিষ্টি আলু স্বাস্থ্যসম্মত যা শর্করার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আমিষ লৌহ ও থায়ামিন, ভিটামিন সরবরাহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। তবে শাকসবজি, ডিম, মাছ বা মাংস ভালো করে সিদ্ধ করে খেতে হবে।

লিভার কিংবা লিভার জাত অন্য খাবার কম খেতে হবে। কারণ এগুলোতে উচ্চমাত্রায় ভিটামনি 'এ' থাকায় তা গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করতে মায়ের অবাঞ্ছিত গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।কারণ কিছু কিছু খাবার যেমন কাঁচা পেঁপে, আলু, ছোলা, গাজর, বিট, ফুলকপি, ধনেপাতা পুদিনাপাতা, চীনাবাদম, কাজু বাদাম, পেস্তা ইত্যাদিতে এমন কিছু উপাদন আছে যা রান্না না করলে জরায়ুর ভ্রূণের ক্ষতিসাধন করে।ফলে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ভালোভাবে সিদ্ধ করলে এসব ক্ষতিকারক উপাদান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এগুলো কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। গর্ভাবস্থায় আনারসও ঝুঁকিপূর্ণ।

গর্ভাবস্থায় সর্বোত্তম ব্যায়াম সোজা হয়ে দ্রুত হাঁটা এবং ব্রিদিং এক্সারসাইজ বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম এটা সহজ ও নিরাপদ ব্যায়াম।মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক নির্মল পরিবেশে হাঁটা, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা, নিয়মিত ধর্ম পালন, পরনিন্দা বা পরচর্চা না করা, অনৈতিক কোনো ভাবনা মনের মধ্যে না আনা, এছাড়াও ধূমপায়ীদের থেকে দূরে থাকা, ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত কারো সংস্পর্শে না আসা উচিত

শিশুদের নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া একটি সংক্রামক ব্যাধি। ফুসফুস বা শ্বাসতন্ত্রকে আক্রান্ত করে, এমন নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ফাঙ্গাস দ্বারা এটি হতে পারে। রোগটি বায়ুবাহিত বলে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়।

নিউমোনিয়া সব বয়সী শিশুর মধ্যে দেখা গেলেও নবজাতক ও পাঁচ বছরের শিশুর ক্ষেত্রে এর ঝুঁকি বেশি। 'জার্নাল অব গ্লোবাল হেলথ'-এর মতে, বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুর প্রধান কারণ নিউমোনিয়া। শুধু শিশু নয়, বিশ্বব্যাপীও নিউমোনিয়া সব বয়সে মানুষের জন্য জীবাণুঘটিত মৃত্যুর একক কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

লক্ষণ

মাঝারি বা তীব্র মাত্রার জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিউমোনিয়ার প্রধান লক্ষণ। শ্বাসকষ্ট হলে প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, বুকের খাঁচা দেবে যায় এমনকি নীল বর্ণ ধারণ করতে পারে শিশু। এ ছাড়া শিশুরা সাধারণত খেতে চায় না।

চিকিৎসা

নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলো দেখা দিলে অবশ্যই শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। নিউমোনিয়ার মাত্রা বুঝে বাড়িতে বা হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

নিউমোনিয়ায় সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক, জ্বরের জন্য প্যারাসিটামলজাতীয় সিরাপ ও বেশি অসুস্থ শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে অক্সিজেন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা পেলে শিশু ৫ থেকে ৭ দিনে ভালো হয়ে যায়।

যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করেনি, একই ঘরে অনেক লোকের সংস্পর্শে থাকে, ঘরের পরিবেশ খোলামেলা ও আলো-হাওয়া যুক্ত নয় এবং সঙ্গে অন্য কোনো অসুখ (যেমন হাম, অপুষ্টি) থাকে, তারা নিউমোনিয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এমন আক্রান্তদের সেরে উঠতেও বেশি সময় লাগতে পারে।

সুরক্ষা, প্রতিরোধ ও প্রতিকার
চারটি ধাপে আমরা শিশুকে নিউমোনিয়ার ঝুঁকিমুক্ত রাখতে পারি।

১. পূর্ণ ছয় মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধু বুকের দুধ খাওয়ালে এবং ছয় মাস পর থেকে পাশাপাশি সুষম পুষ্টিগুণসম্পন্ন বাড়তি খাবার দিলে শিশুর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে উঠবে, যা নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষা দেবে।

২. নিউমোনিয়া প্রতিরোধের টিকা দিতে হবে।

৩. সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, ঘরবাড়ি ধুলা ও দূষণমুক্ত রাখা ইত্যাদি নিউমোনিয়া প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৪. নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলো ও বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে, যেন দ্রুত নিউমোনিয়া আক্রান্ত শিশুকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে বিপদমুক্ত করা যায়।

নিউমোনিয়া একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। সচেতনতাই পারবে এর মৃত্যুঝুঁকি কমাতে পারে।

১২ নভেম্বর বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস। নিউমোনিয়া নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দিনটি বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। এবার দিবসটির স্লোগান 'নিউমোনিয়া যে কারও হতে পারে।

সর্দি-কাশি-জ্বর

এই ভ্যাপসা গরম, এই ঝড়বৃষ্টি। দিনের কখনো গরমে ভিজে বা কখনো বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লাগছে বা আশঙ্কায় থাকতে হচ্ছে। এমন অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় কিছু কিছু ভাইরাস শরীরের ওপর আক্রমণের সুযোগ পায়। আবহাওয়ার এই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে যাঁরা খাপ খাওয়াতে পারেন না, তাঁরাই আক্রান্ত হচ্ছেন জ্বর, সর্দি, কাশি, গলাব্যথাসহ নানা অসুখে। হঠাৎ এমন জ্বর, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা সাধারণের কাছে এটি 'ফ্লু' বা ভাইরাল জ্বর হিসেবে পরিচিত।

ভাইরাসের কারণে জ্বর হলে সাধারণত সাত দিনের মধ্যে এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। হঠাৎ করে ঠান্ডা যাতে না লাগে, তার জন্য বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।
জ্বরের সঙ্গে যদি শরীরে র্যাশ বা ত্বকে ছোট লাল দানা দেখা দেয়, তবে তা ভীতির কারণ হতে পারে। রোগ অনুযায়ী জ্বরের সঙ্গে র্যাশ দেখা দেওয়ার সময় এবং স্থানে ভিন্নতা থাকতে পারে। টাইফয়েড জ্বর, বাতজ্বরসহ নানা কারণে জ্বর হতে পারে।

লক্ষণ
রোগী মূলত জ্বর, কেউ কেউ মাথাব্যথা, সর্দি, অরুচি, গলাব্যথা, কাশির উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন। আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশি। ঠান্ডা-সর্দির কারণে কান বন্ধ হতে পারে। কান বন্ধের সঙ্গে কানে ব্যথাও থাকে। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া উচিত। অনেক সময় শিশুর প্রচণ্ড সর্দি লেগে যায়। কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত জ্বরও দেখা দিতে পারে। তবে বড়দের ক্ষেত্রে জ্বর ততটা তীব্রভাবে না-ও হতে পারে।

জ্বর হলে কী করবেন
জ্বর হলে শরীরের বিপাকক্রিয়া বাড়ে। তাই বাড়তি ক্যালরির প্রয়োজন হয়। অনেকে জ্বর হলে কিছু খাবেন না বলে ঠিক করেন। এতে নিজেরই ক্ষতি। জ্বরে সাধারণত শরীরের তাপমাত্রাকে **১০০-এর নিচে** নামিয়ে আনা, গা মোছা ছাড়াও চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করা হয়। জ্বরের সময় বেশির ভাগ মানুষেরই রুচি কমে যায়। তাই এই সময় রোগীর খাবারের প্রতি অনীহা থাকলেও পুষ্টি উপাদানের চাহিদা পূরণে রোগীকে সঠিক খাবারদাবার চালিয়ে যেতে হয়।

১. তরল: জ্বরের সময় যেই খাবারটির চাহিদা সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়, সেটি হলো তরল জাতীয় খাবার। রোগীর বিপাকের হার বৃদ্ধি, শরীরের তাপমাত্রাকে স্বাভাবিকে আনা, হজমে ব্যাঘাত না ঘটানো ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে তরল খাবার নির্ধারণ করা হয়। তরল হিসেবে ফলের রস, স্যুপ, লাল চা ইত্যাদি খেতে পারেন। বিশেষ করে ভিটামিন সি-যুক্ত ফল, যেমনঃ কমলা, মালটা, লেবু, জাম্বুরা, আনারস ইত্যাদি। ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করবে।

২. নরম পথ্য: তরলের পাশাপাশি রোগীকে নরম বা অর্ধতরল খাবার দেওয়া গেলে ভালো। রোগীকে যেন বেশি চিবোতে না হয়, সহজে গেলা যায় এবং সহজে হজম হয় সে জন্য নরম পথ্য নির্বাচন করতে হবে। যেহেতু তরল খাবারের ক্যালরি কম এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান কম পাওয়া যায়, তাই তরল খাবারের পাশাপাশি রোগীকে নরম খাবারও দিতে হবে। নরম পাতলা মুগডালের খিচুড়ি, জাও ভাত, সুজি, সাগু, পুডিং, নরম কাটা ছাড়া মাছ ইত্যাদি খাবার রোগীকে দিতে পারলে ভালো।

শিশুদের দিকে বিশেষ নজর

ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত শিশু প্রায়ই পানিশূন্যতায় ভোগে। কেননা জ্বরের তাপে শরীর পানি হারায়। তাই শিশুকে প্রচুর পানি ও তরল খাবার দিন। শুধু পানি পান করতে না চাইলে ফলের রস, তরমুজ বা আঙুর, ডাবের পানি, স্যুপ ইত্যাদিও দিন। সেই সঙ্গে শিশুর দরকার প্রচুর বিশ্রাম। বেশির ভাগ শিশুর খাওয়ার রুচি যায় নষ্ট হয়ে, কিছুই খেতে চায় না। এমন খাবার দিন, যা অল্প খেলেও বেশ শক্তি পাবে। যেমন দুধ-চিনি দিয়ে তৈরি কোনো নাশতা, মুরগির মাংসের স্যুপ, পাস্তা, ফলমূল ইত্যাদি।

জ্বর বাড়লে গা মুছে দিন, সঙ্গে সাধারণ প্যারাসিটামল। ওষুধের সঠিক মাত্রাটি জেনে নিন চিকিৎসকের কাছ থেকে। নাক বন্ধ থাকলে স্যালাইন পানির ড্রপ ব্যবহার করা যায়। খুসখুসে কাশিতে মধু বা আদার রস বেশ আরাম দেবে। ভাইরাল ফ্লু বা জ্বর পাঁচ থেকে সাত দিনের মাথায় এমনিতেই কমে যায়। কিন্তু জ্বর দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র মাত্রার হলে, শিশুর শ্বাসকষ্ট হলে বা সে খাওয়াদাওয়া একদম ছেড়ে দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সর্দি, কাশি ও গলাব্যথায় কী করবেন
সর্দি, কাশি বা সামান্য গলাব্যথা এমন কোনো বড় ব্যাপার নয়। তবে একবার ঠান্ডা লাগলে তা সারতে অন্তত এক সপ্তাহ লাগবেই। আর কাশি তো বেশ কয়েক দিন থাকতে পারে, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সাধারণ কাশির চিকিৎসা আপনিই করতে পারেন। এ ধরনের কাশি একটি নির্দিষ্ট সময় পর আপনা-আপনি ভালো হয়ে যায়। কাশির সঙ্গে যদি জ্বর হয়, তাহলে গুরুত্ব দিতে হবে। ঠান্ডা খাবার, ফ্রিজের পানি পরিহার করতে হবে। কুসুম গরম পানি পান করতে পারলে ভালো হয়। হালকা কুসুম কুসুম গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে গলা গড়গড়া করলে গলাব্যথা সহজেই ভালো হয়ে যায়। দিনে কমপক্ষে ২ বার ৫-১০ মিনিট সময়ে গড়গড়া করা উচিত। ধুলাবালু এড়িয়ে চলুন।

ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা

সাধারণত জীবাণু পেটে ঢোকার কারণে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। আর সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকদিনের মাঝেই সেরে যায়। তবে ডায়রিয়া থেকে যদি মারাত্মক পানিশূন্যতা হয়, তবে তা মৃত্যুর কারণও হতে পারে। পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করার উপায় ও পাতলা পায়খানা হলে কী করণীয় তা এই লেখায় থাকছে।

ডায়রিয়ার লক্ষণ

সারাদিনে তিনবার বা তার বেশি নরম বা পাতলা পায়খানা হলে তাকেই সাধারণত ডায়রিয়া বলা হয়। এছাড়া কারও যদি স্বাভাবিকের তুলনায় ঘনঘন পাতলা পায়খানা হয় সেটাকেও ডায়রিয়া হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

যে শিশুরা বুকের দুধ পান করে, তাদের পায়খানা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা নরম আর আঠালো হয়। সেটা ডায়রিয়া নয়।

পানিশূন্যতার লক্ষণ

ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে প্রচুর পানি ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন লবণ বেরিয়ে যায়। যখন এই ঘাটতি পূরণ করা হয় না, তখনই পানিশূন্যতা দেখা দেয়। আর এই পানিশূন্যতা মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে চলে গেলে তা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই ডায়রিয়ার প্রথম চিকিৎসা হলো পানিশূন্যতা পূরণ করা। পানিশূন্যতার প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে–

- মুখ শুকিয়ে আসা
- পিপাসা লাগা
- চোখ শুকনো লাগা বা খচখচ করা
- গাঢ়, তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব হওয়া
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া

পাতলা পায়খানার ঘরোয়া চিকিৎসা

সাধারণত আপনি ঘরোয়াভাবেই পাতলা পায়খানার চিকিৎসা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো পানিশূণ্যতা এড়াতে প্রচুর পরিমাণে তরল পানীয় ও খাবার খাওয়া।

পাতলা পায়খানা হলে কী খাবার খেতে হবে

ডায়রিয়া চিকিৎসায় মূল করণীয় হলো শরীরের পানি ও লবনের ঘাটতি মেটানো। এজন্য ডায়রিয়া হলে প্রচুর পরিমাণে খাবার স্যালাইন, তরল পানীয় ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত। সাধারণত প্রতিবার পাতলা পায়খানা হওয়ার পর এক প্যাকেট বা আধা লিটার করে খাবার স্যালাইন খাওয়ার উপদেশ দেয়া হয়। তরল পানীয়ের মধ্যে চিড়ার পানি, ভাতের মাড়, কিংবা ডাবের পানি খাওয়া যেতে পারে। ভাতের মাড়ে সামান্য লবণ দিতে পারেন। যখনই মনে হবে খেতে পারবেন, তখনই খেয়ে নিবেন। শিশুদের ক্ষেত্রে অবশ্যই বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।

ডায়রিয়া হলে যা খাবেন না

নির্দিষ্ট কোন খাবার খেলেই ডায়রিয়া সেরে যাবে, এমন কথার ভিত্তি নেই। যেমন, এমন ধারণা প্রচলিত আছে যে ডায়রিয়ার রোগী সাদা ভাত আর কাঁচকলা ছাড়া আর কিছুই খেতে পারবে না। এই ধারণা টা সঠিক নয়। পাতলা পায়খানা হলেও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি সব ধরনের পুষ্টিকর খাবারই খাওয়া উচিত। তবে ডায়রিয়া হলে বাজার থেকে কেনা ফলের জুস, কোমল পানীয়, কফি, চিনি দেয়া চা পরিহার করবেন। কারণ এসব খেলে ডায়রিয়া আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে।

ডায়রিয়ার ঔষধ

ডায়রিয়া সাধারণত ৫-৭ দিনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তবে ডায়রিয়ার কারণে সৃষ্ট পানিশূন্যতার দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়িতে বসেই চিকিৎসার মাধ্যমে ডায়রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। নিচে ডায়রিয়ার ওষুধগুলো উল্লেখ করা হলো–

১। খাবার স্যালাইন: সাধারণত প্রতিবার পাতলা পায়খানা হওয়ার পর এক প্যাকেট বা আধা লিটার করে খাবার স্যালাইন খাওয়ার উপদেশ দেয়া হয়। ঘরে খাবার স্যালাইন না থাকলেও ঘরোয়া উপায়ে খাবার স্যালাইন তৈরি করে নিতে পারেন। এছাড়া চিড়ার পানি, ভাতের মাড়, কিংবা ডাবের পানিও খাওয়া যেতে পারে। ভাতের মাড়ে সামান্য লবণ দিতে পারেন। বমি ভাব হলে ছোট ছোট চুমুকে খাওয়ার চেষ্টা করবেন।

২। জিংক ট্যাবলেট: ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ১০-১৪ দিনের জন্য ২০ মিলিগ্রাম করে জিংক ট্যাবলেট কিংবা সিরাপ খাওয়াতে পারেন।

৩। প্যারাসিটামল: পেটে অস্বস্তি বোধ করলে প্যারাসিটামল খাওয়া যেতে পারে। শিশুকে ওষুধ দেওয়ার আগে ওষুধের সাথে থাকা নির্দেশিকা ভালো মত পড়ে নিবেন, আর অবশ্যই বয়স অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে ওষুধ খাওয়াতে হবে।

ডায়রিয়ার ওষুধের সাথে পুষ্টিকর খাবারও খেতে হবে। পুষ্টিহীনতা থেকে ডায়রিয়া হয়, আবার ডায়রিয়ার কারণে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাই ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের বুকের দুধ এবং সবার জন্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়া চালিয়ে যেতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, মারাত্মক পানিশূন্যতা হলে হাসপাতালে ভর্তি করে ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় স্যালাইন দিতে হতে পারে।

ডায়রিয়া বিস্তার ঠেকাতে যা করবেন

- বারবার সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুবেন।
- পায়খানা কিংবা বমির সংস্পর্শে এসেছে এমন কাপড় বা বিছানার চাদর গরম পানি দিয়ে আলাদাভাবে ধুয়ে ফেলবেন।
- পানির কল, দরজার হাতল, টয়লেট সিট, ফ্লাশের হাতল, জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে পারে এমন জায়গা প্রতিদিন পরিষ্কার করবেন।

ডায়রিয়ার চিকিৎসায় কখন দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাবেন?

ডায়রিয়া হলে যদি নিচের লক্ষণগুলোর কোনটি দেখা দেয়, তাহলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন। ডায়রিয়ার গুরুতর লক্ষণগুলো হলো–

- পায়খানার সাথে রক্ত বা আঠালো মিউকাস যাওয়া
- প্রচণ্ড পেটব্যথা
- ডায়রিয়ার অবস্থার উন্নতি না হওয়া
- পানিশূন্যতা পূরণ না হওয়া
- ডায়রিয়ার সাথে ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জ্বর, অর্থাৎ শরীরের তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি থাকা

এগুলো গুরুতর অবস্থা নির্দেশ করে, তাই ঘরোয়া চিকিৎসার সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পেট ব্যথা

বেশিরভাগ সময়েই পেট ব্যথা কোন গুরুতর রোগের কারণে হয় না। কয়েকদিনের মাঝেই সেরে যায়। আমাদের যে বিভিন্ন রকমের পেট ব্যথা হয় এবং সেগুলোর সম্ভাব্য কারণ এই আর্টিকেলে আলোচনা করা হয়েছে। তবে নিজেই নিজের রোগ নির্ণয় করার চেষ্টা করবেন না। ব্যথা নিয়ে চিন্তিত হলে অবশ্যই একজন ডাক্তারের শরনাপন্ন হবেন। আর যে ১১টি সময়ে আপনাকে দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে, সেগুলো অবশ্যই জেনে নিবেন।

পেট ব্যথা কেন হয়?

পেটব্যথারধরন	সম্ভাব্যকারণ
পেটফাঁপাবোধকরাওঅতিরিক্তবায়ুত্যাগকরা	আটকেথাকাবায়ু
খাওয়ারপরপেটভরাভরাবাফেঁপেআছেএমনমনেহওয়া, বুকজ্বালাপোড়াকরাএবংবমিবমিলাগা	বদহজম
পায়খানানাহওয়া	কোষ্ঠকাঠিন্য
পেটেরনীচেরঅংশেডানদিকেহঠাৎব্যথাশুরুহওয়া	অ্যাপেন্ডিসাইটিস
পেটকামড়ানো, পেটফেঁপেওঠা, পাতলাপায়খানা, কোষ্ঠকাঠিন্যহওয়া	ইরিটেবলবাওয়েলসিন্ড্রোমবাআইবিএস
পেটবাপিঠেরএকপাশেতীব্রব্যথাহওয়াযাকুঁচকিপর্যন্তনেমেআসে, বমিবমিভাবহওয়া, প্রস্রাবকরারসময়ব্যথাঅনুভবকরা	কিডনিতেপাথর
পেটেরমাঝামাঝিঅংশেবাপাঁজরেরডানপাশেরঠিকনীচেকয়েকঘন্টাধরেপ্রচণ্ডব্যথাহওয়া	পিত্তথলিতেপাথর
পেটেরমাঝামাঝিঅংশেহঠাৎতীব্রব্যথাহওয়া, বমিভাববাবমিহওয়া, গায়েজ্বরআসা	প্যানক্রিয়াটাইটিস
মাসিকেরসময়পেটেব্যথাহওয়াবাকামড়ানো	মাসিকের ব্যথা

পেট ব্যথা হলে কখন ডাক্তারের সহায়তা নিবেন?

- বারবার পেট ব্যথা অথবা পেট ফেঁপে ওঠার সমস্যা হতে থাকে
- পেট ব্যথা বা পেট ফাঁপা দীর্ঘ সময় ধরে থাকে এবং সহজে সারতে চায় না
- পেট ব্যথার পাশাপাশি খাবার গিলতে সমস্যা হয়, খাবার গলায় আটকে যায়
- কোন কারণ ছাড়াই শরীরের ওজন কমতে থাকে
- ঘন ঘন বমি হয়
- পেটে চাকার মত মনে হয়
- আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতায় ভোগেন
- হঠাৎ করেই আপনার প্রস্রাব স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশী বার হয়
- প্রস্রাব করার সময় আপনি ব্যথা অনুভব করেন
- পায়খানার রাস্তা অথবা যোনিপথ তথা মাসিকের রাস্তা দিয়ে রক্ত যায়, অথবা মাসিকের রাস্তা দিয়ে এমন স্রাব যায় যা অস্বাভাবিক

কেমন পেট ব্যথা হলে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে যাবেন

- ব্যথা খুব দ্রুত খারাপ হয়ে যায় বা গুরুতর রূপ ধারন করে
- একেবারে হঠাৎ করেই পেট ব্যথা শুরু হয় বা ব্যথা প্রচণ্ড তীব্র হয়
- পেটে স্পর্শ করলে সেই জায়গা ব্যথা করে
- বমির সাথে রক্ত যায় বা বমির রং কফিদানার মত কালচে বাদামী হয়

- পায়খানার সাথে রক্ত যায় বা পায়খানা কালো, আঠালো এবং প্রচণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত হয়
- প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়
- পায়খানা বা বায়ু ত্যাগ বন্ধ হয়ে যায়
- শ্বাস নিতে কষ্ট হয়
- বুকে ব্যথা হয়
- ডায়বেটিস আছে এমন কারো বমি হয়
- রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়

এসব লক্ষণ মারাত্মক কোন রোগের কারণে হতে পারে। দ্রুত চিকিৎসা না পেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই দেরি না করে অবশ্যই দ্রুত হাসপাতালে যাবেন।

পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টি

পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টি কাকে বলে:-

পুষ্টি উপাদান অর্থাৎ বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের অপর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে দেহে এসবের অভাবজনিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। একেই আমরা পুষ্টিহীনতা বলে থাকি।

আমাদের সমাজে অপুষ্টিজনিত উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলো হলো

১. প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টি :
আমিষ ও ক্যালরির (শক্তি) অভাবে শিশুদের কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাস রোগ হয়। কোয়াশিওকের রোগে শিশুর ওজন কমে, বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শরীর ও মুখে পানি আসে। ম্যারাসমাস রোগে শিশুর বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং শিশু হাড্ডিসার হয়ে যায়।
২. রক্তস্বল্পতা বা এনিমিয়া :
বিশেষ করে লৌহ (আয়রণ) জাতীয় খাদ্যের অভাবে এনিমিয়া হয়। রক্ত কণিকা গঠনে লৌহ, প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদানের ঘাটতিজনিত কারণে এ রোগ হয়ে থাকে।

৩. ভিটামিন এ এর অপুষ্টি:

ভিটামিন এ এর ঘাটতি থেকে রাতকানাসহ চোখের নানা ধরনের অসুস্থতা দেখা যায়।

৪. রিকেটস :

খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত কারণে শিশুদের রিকেটস রোগ হয় ।

৫. গলগন্ড :

আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড (ম্যাগ) সহ অন্যান্য জটিলতা দেখা দেয়। যেমন- শিশু মৃত্যু, বামনত্ব, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা ইত্যাদি।

এছাড়া ভিটামিন বি এর অভাবে বেরিবেরি, জিহ্বায় ও ঠোঁটের কোণায় ঘা ইত্যাদি হয়ে থাকে।

শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টি কী?

অপুষ্টি হলো এমন একটা অবস্থা যেখানে আপনার শিশু তার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর বিকাশে সহায়ক প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং মিনারেল সমৃদ্ধ সুষম খাবার গ্রহণ করে না। পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে শিশুর শারীরিক ও আচরণগত বিভিন্ন প্রকার জটিল রোগ দেখা যায়।

শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির লক্ষণ ও উপসর্গঃ

- ক্লান্তি ও অবসাদ
- খিটখিটে স্বভাব
- মনোযোগহীনতা
- শুষ্ক ও খসখসে ত্বক
- মাড়িতে রক্তপাত
- ক্ষুধামান্দ্য
- কম শারীরিক বৃদ্ধি বা একদমই বৃদ্ধি থেমে যাওয়া
- ফুলে যাওয়া পেট
- ধীর আচরণ ও ধীর বুদ্ধিগত বিকাশ
- হজমজনিত সমস্যা
- পেশির ভর হ্রাস
- ক্রমশ ওজন কমতে থাকে

অপুষ্টি প্রতিরোধে খাবারঃ

অপুষ্টি রোধ করতে আপনার শিশুকে-

- প্রত্যেক ঋতু বা মৌসুম ভিত্তিক ফল ও সবজি খাওয়াতে হবে।
- ফল ও শাকসবজি প্রতিদিন কমপক্ষে দুই বার খাওয়াতে হবে।
- দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য যেমন ক্ষীর, পায়েস বা দুধের তৈরি সেমাই খাওয়ানো যেতে পারে।
- ভাত, রুটি, আলু মানে শর্করা জাতীয় খাবার খাওয়াতে হবে।
- ডিম, মাছ, মসুর ডালের মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করাতে হবে। প্রতিদিন দেড় লিটারের বেশি পানি পান করাতে হবে।
- প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় তেল, চর্বি ও বাদাম জাতীয় খাবার রাখতে হবে।

আর খেয়াল রাখতে হবে, শিশুকে কখনই জোর করে ভয় দেখিয়ে খাওয়ানো যাবে না। এছাড়াও শিশুদের অপুষ্টি প্রতিরোধের অংশ হিসেবে প্রতিটি পরিবারকে স্বাস্থ্যকর ও শিশুবান্ধব পুষ্টি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। শিশুর জন্মের পর প্রথম ছয় মাস বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। এটি সর্বোত্তম বৃদ্ধি এবং একটি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ অর্জনে সহায়তা করে। জন্ম থেকে প্রথম তিন বছর পর্যন্ত ভালো এবং স্বাস্থ্যকর পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার একটি শিশুর সুন্দর ও উজ্জ্বল বৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস কী?

ডায়াবেটিস একধরনের মেটাবলিক ডিজঅর্ডার। শরীরে ইনসুলিন আছে, কিন্তু কাজ করতে পারছে না। কিংবা ইনসুলিন একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা সাধারণত চার ধরনের ডায়াবেটিসের কথা বলি। টাইপ-১, টাইপ-২, জেস্টেশনাল এবং অন্যান্য। টাইপ-১ মানে হলো, যেভাবেই হোক, যাঁদের শরীরে ইনসুলিন নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁদের যদি আলাদা করে ইনসুলিন দেওয়া না হয়, তাহলে তাঁরা মারা যেতে পারেন। আমরা যখন বাইরের নানা ধরনের খাবার খাই, ফাস্ট ফুড খাই, তখন শরীরে একধরনের পরিবর্তন আসে। দেখা যায়, শরীরে ইনসুলিন আছে, কিন্তু সেটা কাজ করতে পারছে না। তখন আমরা যে খাবারই খাই, সেটার গ্লুকোজ জমে যায়। এটা টাইপ-২ ডায়াবেটিস।

ডায়াবেটিস কেন হয়?লক্ষণগুলো কী?

বারবার প্রস্রাব করা, খাবার খেয়েও ক্ষুধা না মেটা, ক্লান্ত লাগা, ঝিম ধরা ভাব, কোথাও কেটে গেলে বা ঘা হলে সহজে সেটা না শুকানো—এ রকম কিছু লক্ষণ থাকে।

ডায়াবেটিস হলে করব কী?

চারটি করণীয়। মুখে সেবন করা ওষুধ, ইনসুলিন, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, মানসিক সমর্থন। এগুলো খুবই জরুরি। ড্রাগ (ওষুধ), ডায়েট, শৃঙ্খলা (ডিসিপ্লিন)—এগুলো জরুরি। জীবনযাপন ঠিক রাখতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে। নিয়মিত চেকআপও করতে হবে। বাসায় গ্লুকোমিটার রেখে নিয়মিত মাপতে হবে। ডায়াবেটিস হওয়ার পর যদি কোনো রোগী এসব মেনে খাওয়ার আগে পাঁচ থেকে ছয় আর খাওয়ার পরে দশের নিচে রাখতে পারেন, তাহলে ভালো। তিনি দীর্ঘ সময় ডায়াবেটিস নিয়ে সুস্থ থাকবেন। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবারের সমর্থন খুবই জরুরি।

বুকে ব্যথা (Angi na)

কে ব্যথা হলে কমবেশি অনেকেই ভয় পান, হার্টের সমস্যা হলো না তো? হ্যাঁ, বুকে ব্যথা হৃদ্রোগের একটি অন্যতম উপসর্গ বটে, কিন্তু এ সমস্যা ছাড়াও বুকে ব্যথা হতে পারে। খাদ্যনালির সমস্যা, পেপটিক আলসার, ফুসফুস ও পাঁজরের সমস্যায় এমনকি মানসিক উদ্বেগজনিত সমস্যায়ও বুকে ব্যথা হয়।

আবার হৃদ্রোগে যে বুকে ব্যথা হবেই, এমনও কোনো কথা নেই। কোনো রকম বুকে ব্যথার ইতিহাস ছাড়াই বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে বা হৃদ্যন্ত্রের রক্তনালিতে ব্লক পাওয়া গেছে—এমন ঘটনা বিরল নয়। বিশেষ করে দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিসে, বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের এবং স্নায়ু জটিলতার কারণে হৃদ্রোগ থাকা সত্ত্বেও কোনো রকম বুকে ব্যথা অনুভূত হয় না।

তবে কখন সন্দেহ?

সাধারণত হৃদ্যন্ত্রের সমস্যায় বা করোনারি ধমনিতে বাধার কারণে যে বুকে ব্যথা হয়ে থাকে, তার কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষণ থাকতে

পারে। এটি সাধারণত বুকের একেবারে মাঝখানটিতে অনুভূত হয়। এমন মনে হয় যে কেউ বুকটাকে চাপ দিয়ে ধরছে, ভার বোধ হচ্ছে বা মুচড়ে যাচ্ছে। ব্যথা ঘাড়, কাঁধ, চোয়াল, বাম হাত, এমনকি পিঠেও ছড়িয়ে যেতে পারে। হাঁটাচলা, সিঁড়ি ভাঙা, পরিশ্রম, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদিতে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। কখনো ভারী খাবারদাবার, ঠান্ডা আবহাওয়া বা অধিক উত্তেজনাও হতে পারে ব্যথার উৎপত্তি। ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে বুকে ব্যথা হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। করোনারি ধমিনতে বাধা বা ব্লকের কারণে হৃৎপিণ্ডে যথেষ্ট রক্ত বা অক্সিজেন সরবরাহ না হওয়াই এই ব্যথার কারণ। একে অ্যানজিনা বলা হয়। অ্যানজিনার ব্যথা বিশ্রাম নিলে বা জিবের নিচে নাইট্রোগ্লিসারিন স্প্রে নিলে সেরে যায়। তবে যখন এ ধরনের ব্যথা বিশ্রাম নিয়েও কমছে না, দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে, প্রচণ্ডতায় বাড়ছে, সঙ্গে ঘাম ও বমি ভাব হচ্ছে, তখন হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে সন্দেহ করা যায়।

বুকে ব্যথা একটি জরুরি অবস্থা

- অল্পস্বল্প বুকে ব্যথা হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত; বিশেষ করে যদি আপনার বয়স চল্লিশের ওপর,
- পরিবারে হৃদ্রোগের ইতিহাস থাকে,
- আপনি যদি ধূমপায়ী হয়ে থাকেন বা আপনার উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা রক্তে চর্বির আধিক্য থাকে।

এসব বিবেচনা করে এবং কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আপনার আসলেই হৃদ্রোগ আছে কি না, তা নিশ্চিত হয়ে নেওয়াই ভালো।

নিম্ন রক্তচাপ

অনেকে বলেন, আমার ‘লো প্রেশার, সব সময় রক্তচাপ কম থাকে। অনেকে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন। আসলেই কি কারও লো প্রেশার বা নিম্ন রক্তচাপ থাকতে পারে?কেনই-বা হয়?

রক্তচাপ মাপার সময় আমরা দুটো পরিমাপ দেখি। ওপরেরটা হলো সিস্টোলিক রক্তচাপ। আর নিচেরটা হলো ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ। সিস্টোলিক রক্তচাপ ১২০ মিলিমিটারের কম আর ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৮০ মিলিমিটারের কম থাকা উচিত, এটাই রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা। কিন্তু কত কম পর্যন্ত স্বাভাবিক?

আসলে সিস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ মিলিমিটারের কম অথবা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৬০ মিলিমিটারের কম না হলে নিম্ন রক্তচাপ বা “লো প্রেশার” বলা হয় না। তার মানে ৯০/৬০ মিলিমিটার থেকে ১২০/৮০ মিলিমিটার পর্যন্ত মাত্রা হলো স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকে সামান্য কমের দিকে রক্তচাপ পেলেই তাকে কম রক্তচাপ, নিম্ন রক্তচাপ বা “লো প্রেশার” ভাবেন, যা ঠিক নয়।

রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা যখন কমের দিকে

- ✓ অ্যাথলেট, দৌড়বিদ বা নিয়মিত ভারী পরিশ্রম করেন এমন ব্যক্তিদের রক্তচাপ স্বাভাবিকভাবেই কমের দিকে থাকে।
- ✓ বয়স্ক ব্যক্তিদের নানা কারণে রক্তচাপ কমতে পারে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো নানাবিধ ওষুধের ব্যবহার।
- ✓ শোয়া বা বসা থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে রক্তচাপ একটু কমে যায়। ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে ১০ থেকে ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে এই সমস্যা থাকে।
- ✓ রাতে, ঘুমের মধ্যে বা ঘুমের পরে এবং খাওয়ার পর রক্তচাপ খানিকটা কম থাকে।
- ✓ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার প্রথম দিকে রক্তচাপ কম থাকতে পারে।

রক্তচাপ কমে যাওয়া যখন উপসর্গ

- ✓ ডায়রিয়া, বমি, রক্তক্ষরণ, রক্তশূন্যতা বা পানিশূন্যতায় রক্তচাপ কমার আশঙ্কা থাকে।
- ✓ হরমোনজনিত কিছু সমস্যা, বিশেষ করে থাইরয়েড ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির হরমোন সমস্যায় রক্তচাপ কমে যেতে পারে।
- ✓ হৃদ্‌রোগ যেমন হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিওর, হার্ট-ভালভের অসুখ এবং জন্মগত হৃদ্‌রোগ থেকেও রক্তচাপ কম হতে পারে।

কম রক্তচাপের লক্ষণ

রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে সাধারণত যেসব লক্ষণ দেয়, তা হলোঃ

- ✓ মাথা ঝিমঝিম, মাথা ঘোরা বা মাথা হালকা বোধ করা।
- ✓ বসা বা শোয়া থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে ভারসাম্যহীনতা।
- ✓ দুর্বল লাগা।
- ✓ চোখে ঘোলা বা অন্ধকার দেখা।
- ✓ খুব তৃষ্ণা অনুভূত হওয়া।
- ✓ হঠাৎ পড়ে যাওয়া বা জ্ঞান হারানো।
- ✓ স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত গতির হৃৎস্পন্দন।
- ✓ হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা।
- ✓ প্রস্রাব কম হওয়া।

রক্তচাপ কমলে করণীয়

অনেকেরই রক্তচাপ স্বাভাবিকভাবে একটু কমের দিকে থাকে। এতে তাঁদের কোনো সমস্যা হয় না। এ নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। যাঁরা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খাচ্ছেন, তাঁরা অনেক সময় স্বাভাবিক বা একটু কমের দিকে রক্তচাপ পেলে ভয়ে ওষুধ বন্ধ করে দেন। এটাও ঠিক না। দরকার হলে ওষুধ বা এর মাত্রা পরিবর্তন করার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন না। তবে রক্তচাপ বেশি কমে গিয়ে কারও সমস্যা হলে বা কোনো উপসর্গ দেখা দিলে, সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে চিকিৎসা নিতে হবে। রক্তচাপ খুব বেশি কমে গেলে মস্তিষ্ক, কিডনি ও হৃৎপিণ্ড রক্তস্বল্পতায় ভুগতে পারে এবং তা থেকে এসব অঙ্গের নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে।

হঠাৎ রক্তচাপ কমে গেলে

কম রক্তচাপ কোনো অসুখের উপসর্গ হলে, হঠাৎ তা দেখা দিতে পারে। এ সময় নাড়ির গতি বা পালস স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত গতির হয় এবং রোগীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। এটি শকের লক্ষণ। নানা কারণে রোগী শকে যেতে পারে। ডায়রিয়া, বমি, রক্তক্ষরণ, রক্তশূন্যতা, পানিশূন্যতা, ইনফেকশন এবং হৃদ্‌রোগে হঠাৎ নিম্ন রক্তচাপ থেকে শকের ঘটনা বেশি ঘটে।

প্রতিরোধ

- ✓ দীর্ঘ সময় এক স্থানে বসা বা শুয়ে থাকার পর ধীরে উঠতে হবে। ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের এটা অবশ্যই করা উচিত।
- ✓ লম্বা সময় খালি পেটে থাকা উচিত নয়। দীর্ঘ কাজের ফাঁকে হালকা নাশতার অভ্যাস করা ভালো।
- ✓ পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। গরমের দিনে অতিরিক্ত ঘামে যাতে শরীরে পানিশূন্যতা তৈরি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ✓ অনেকে ভুল ধারণাবশত খাবারের তালিকা থেকে লবণ একেবারে বাদ দিয়ে দেন। এটা ঠিক নয়। সব মিলিয়ে দৈনিক এক চামচের মতো লবণ খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে।
- ✓ ডায়রিয়া বা বমি হলে যাতে শরীরে পানিশূন্যতা তৈরি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ সময় পরিমাণমতো খাবার স্যালাইন, তরল খাবার, ডাবের পানি পান এবং স্বাভাবিক খাবার খেতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ

হৃদ্‌রোগের অন্যতম কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ। সাধারণত কারও রক্তচাপ ১৪০/৯০ মার্কারি বা এর বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্বে ১৫০ কোটির বেশি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশেও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ২১ শতাংশ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। নানা কারণে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে।

উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো–

- অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ, ধূমপান,
- কায়িক পরিশ্রম না করা,
- দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ,
- মদ্যপান,
- স্থুলতা
- এমনকি বংশগত কারণের প্রভাব আছে।

রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি সবারই মেনে চলা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নিজের রক্তচাপও জেনে রাখা উচিত। যাঁরা এরই মধ্যে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের এটি নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করতে হবে। এটি খুব সহজ এবং ঘরে বসেই করা যায়। এ জন্য নিয়মগুলো জানা প্রয়োজন।

বাড়িতে রক্তচাপ মাপার নিয়ম

চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রক্তচাপ মাপার উপযুক্ত যন্ত্র কিনতে হবে। বাজারে বিভিন্ন মাপের বাহুবন্ধনী পাওয়া যায়, তাই কেনার আগে সঠিকভাবে এর মাপ নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী বা বিক্রেতার সহযোগিতা নিতে হবে। মাপ সঠিক না হলে রক্তচাপের পরিমাণ বা রিডিং সঠিক হয় না। বর্তমানে অবশ্য রক্তচাপ মাপার জন্য অনেক ব্র্যান্ডের ডিজিটাল যন্ত্রও পাওয়া যায়।

- রক্তচাপ পরিমাপের আগে অন্তত ৩০ মিনিটের মধ্যে ভারী কোনো কাজ করা, ব্যায়াম করা, হাঁটা ও চা-কফি পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

- চেয়ারে হেলান দিয়ে এমনভাবে বসতে হবে যেন পায়ের পাতা মেঝেতে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, পায়ের ওপর পা উঠিয়ে বসা যাবে না।
- হাতের নিচে তোয়ালে বা বালিশ রেখে এমনভাবে বসতে হবে যেন হাত হৃদ্‌পিণ্ডের সমান্তরালে থাকে। এক হাতের ওপর অন্য হাত রাখা যাবে না।
- বাহুবন্ধনী সঠিকভাবে হাতে লাগাতে হবে, রক্তচাপের সঠিক রিডিং পেতে এটি গুরুত্বপূর্ণ।
- ১ মিনিটের ব্যবধানে ২-৩ বার রিডিং নিতে হবে। সঠিক নিয়মে রক্তচাপ পরিমাপ করে সঙ্গে সঙ্গেই তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- সাত দিনব্যাপী বাড়িতে সকাল ও সন্ধ্যা দুবার রক্তচাপ পরিমাপের মাত্রাকে রক্তচাপের রেকর্ড হিসেবে গণ্য করতে হয়।

রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে যা করবেন

সব ধরনের তামাকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে পরিবারের সবাইকে বিরত থাকতে হবে। তামাক গ্রহণের অভ্যাস কারও মধ্যে থাকলে তা আজই ছেড়ে দেওয়ার জন্য মনস্থির করুন।অতিরিক্ত ওজনের অধিকারী ব্যক্তিদের নিজ নিজ আদর্শ ওজন ফিরে পেতে চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তির ওজন পরিমাপের দুটি উপায় আছে। বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) এবং পেটের মাপ। বিএমআই একজন ব্যক্তির গড় ওজন নির্দেশ করে। ব্যক্তির ওজন (কিলোগ্রাম) ও উচ্চতার (মিটার) ভাগফলই তার বিএমআই। বিএমআই ১৮.৫-২৪.৯৯-কে আদর্শ ধরা হয়। উল্লেখ্য, দেশ ও জাতিভেদে এ পরিমাপের তারতম্য হতে পারে।

- স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাবার গ্রহণ করতে হবে। সকাল, দুপুর ও রাত—এই তিন বেলায় বয়স ও প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাবার গ্রহণ করতে হবে। কোনো বেলার খাবার বাদ দেওয়া যাবে না।
- ফাস্ট ফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- প্রচুর পরিমাণে টাটকা ও রঙিন শাকসবজি, দেশীয় ও মৌসুমি ফলমূল খেতে হবে।
- খাদ্যতালিকায় রেড মিটের পরিবর্তে মুরগির মাংস ও ছোট-বড় বিভিন্ন রকম মাছ রাখতে হবে।
- সপ্তাহে অন্তত এক দিন নিরামিষভোজী হওয়া দরকার।
- রান্না করার সময় অল্প বা পরিমিত লবণ ব্যবহার করতে হবে।
- যতদূর সম্ভব সোডিয়াম ও অন্যান্য লবণ কম পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। খাবারের সঙ্গে বা পাতে আলগা লবণ গ্রহণ পরিহার করতে হবে।

- খাদ্য সংরক্ষণে লবণের পরিবর্তে ভিনেগার, লেবুর রস, কাঁচা রসুন ও মসলা ব্যবহার করতে হবে।
- খাবার কেনার সময় পণ্যের গায়ে সোডিয়ামের পরিমাণ ভালোভাবে পড়ে অপেক্ষাকৃত কম সোডিয়ামসমৃদ্ধ খাবার বেছে নিতে হবে।
- মদ্যপান বা অ্যালকোহল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- কায়িক পরিশ্রম করতে হবে, নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- নিয়মিত হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটার জন্য চেষ্টা করতে হবে। দিনে অন্তত ১০ মিনিট সাধারণ ব্যায়াম করা উচিত।
- লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে।
- সম্ভব হলে হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে অফিস এবং নিকটবর্তী গন্তব্যে যাওয়ার অভ্যাস করা উচিত।

উচ্চ রক্তচাপ কমাতে ওষুধের ভূমিকা

উচ্চ রক্তচাপে ইতিমধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর শরণাপন্ন হয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিয়ে ওষুধ সেবন করতে হবে। কিছু ওষুধ উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক প্রতিরোধ করে।

মনে রাখতে হবে...

- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হবে।
- ওষুধ সেবনে অনিয়ম-অবহেলা করলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কোনো ফল পাওয়া যাবে না।
- সাধারণত প্রতিটি ওষুধের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে, তাই ওষুধ সেবনের ফলে কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। নিজে নিজে বন্ধ করা বা পরিবর্তন করা চলবে না।
- ওষুধ সেবনের পাশাপাশি নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করতে হবে।

মাইগ্রেন/মাথাব্যথা

মাইগ্রেন বিশেষ ধরনের মাথাব্যথা। মাথার যেকোনো এক পাশ থেকে এই ব্যথা শুরু হয় এবং ক্রমে তা বিস্তৃত হতে থাকে। মস্তিষ্কের বহিরাবরণে যে ধমনিগুলো আছে, সেগুলো স্ফীত হয়ে যায়। অনেক সময় এর তীব্রতা শীতে বাড়ে।

কেন হয়

- ✓ কারণ এখনো অজানা। তবে এটি সাধারণত নারীদের বেশি হয়। বিশেষত নারীদের মাসিকের শুরুতে ও মাসিকের সময় দেখা দিতে পারে।
- ✓ চকলেট, পনির, কফি ইত্যাদি বেশি খাওয়া, জন্মবিরতিকরণ ওষুধ, দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত ভ্রমণ, ব্যায়াম, অনিদ্রা
- ✓ অনেকক্ষণ টিভি দেখা বা কম্পিউটারে কাজ করা, মোবাইলে কথা বলা ইত্যাদির কারণে রোগটি বাড়ে।
- ✓ কোষ্ঠকাঠিন্য, দুশ্চিন্তা, অতি উজ্জ্বল আলো, মানসিক চাপ মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়ায়।

লক্ষণ

- ✓ মাথাব্যথা ও বমিভাব এ রোগের প্রধান লক্ষণ। তবে অতিরিক্ত হাই তোলা, কোনো কাজে মনোযোগ নষ্ট হওয়া
- ✓ বিরক্তি বোধ করা ইত্যাদি ব্যথা শুরুর আগেই দেখা দিতে পারে।
- ✓ চোখের পেছনে ব্যথার অনুভূতি তৈরি হতে পারে। ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেনের সঙ্গে দৃষ্টি সমস্যা, যেমন চোখে উজ্জ্বল আলোর অনুভূতি, হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়া, দৃষ্টিসীমানা সরু হয়ে আসা অথবা যেকোনো এক পাশ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। ২০ মিনিট স্থায়ী এসব উপসর্গের পর বমির ভাব ও মাথাব্যথা শুরু হয়, যা সাধারণত এক পাশে হয়। দৃষ্টির সমস্যা এক ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হলে ধরে নিতে হবে এটি মাইগ্রেন নয়।

যা করতে হবে

- ✓ মাইগ্রেন চিকিৎসায় তাৎক্ষণিক ও প্রতিরোধক ওষুধের পাশাপাশি কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে সমস্যা অনেকাংশে কমে যায়।
- ✓ প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে হবে। অতিরিক্ত বা কম আলোয় কাজ না করা, কড়া রোদ বা তীব্র ঠান্ডা পরিহার করা, উচ্চ শব্দ ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে বেশিক্ষণ না থাকা, বেশি সময় ধরে কম্পিউটারের মনিটর ও টিভির সামনে না থাকা।
- ✓ মাইগ্রেন শুরু হয়ে গেলে প্রচুর পানি পান করা উচিত। বিশ্রাম নিন, ঠান্ডা কাপড় মাথায় জড়িয়ে রাখতে পারেন।
- ✓ মাইগ্রেন প্রতিরোধী খাবার যেমন ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত, আলু ও বার্লি। বিভিন্ন ফল, বিশেষ করে খেজুর ও ডুমুর ব্যথা উপশম করে। সবুজ, হলুদ ও কমলা রঙের শাকসবজি নিয়মিত খেলে উপকার হয়। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি মাইগ্রেন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।
- ✓ আদার টুকরা, আদার রস বা জিঞ্জার পাউডার দিনে দুবার পানিতে মিশিয়ে পান করতে পারেন

এড়িয়ে চলবেন

- ✓ চা, কফি ও কোমল পানীয়, চকলেট, আইসক্রিম, দই, ডেয়ারি পণ্য (দুধ, মাখন), টমেটো ও সাইট্রাস-জাতীয় ফল।
- ✓ গমজাতীয় খাবার যেমন রুটি, পাস্তা, ব্রেড ইত্যাদি। আপেল, কলা ও চিনাবাদাম, অতিরিক্ত পেঁয়াজ।

কী ওষুধ খাবেন?

চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

Arthritis

(বাত)

বাতের ব্যথা মূলত দুই ধরণের কারণে হয়ে থাকে।

- প্রথমত, বয়স জনিত হাড়ের দুর্বলতা থেকে এবং
- দ্বিতীয়ত, হাড়ের জয়েন্ট দুর্বল ও হাড়ে ক্যালসিয়ামের অভাব জনিত কারনে। প্রথমে এটি পায়ের আঙ্গুলে পরে আস্তে আস্তে হাড়সহ শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বাত আক্রান্তস্থানে প্রচুর গরম অনুভুত হয় এবং অসহনীয় ব্যাথার সৃষ্টি হয়।

রোগের প্রাদুর্ভাব

বাত সাধারণত ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সী পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয়ে থাকে। মহিলাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এটি রজঃনিবৃত্তির পর অর্থাৎ ৪৫ বছরের পর দেখা দেয়। শিশু এবং তরুণদের সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায় না।

রোগের লক্ষণগুলো

বাতের সমস্যা সাধারণত বৃদ্ধাঙ্গুলিতে প্রথম দেখা দেয়। এর প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে—

– প্রদাহ

– ব্যথা

– অস্থিসন্ধি লাল হয়ে যাওয়া

– অস্থিসন্ধি ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

– বাতে পায়ের আংগুল নাড়াতে তীব্র ব্যথা হয়; অনেক সময় রোগীরা বলে থাকে যে, চাদরের স্পর্শেও ব্যথা লাগে। বাতের লক্ষণগুলো খুব দ্রুতই দেখা দেয়, যেমন কখনও কখনও এক দিনের মধ্যেই দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে একটি মাত্র অস্থিসন্ধিতে লক্ষণ দেখা দেয়। বিরল ক্ষেত্রে ২-৩টি অস্থিসন্ধিতে এক সঙ্গে ব্যথা হয়। যদি অনেক স্থানে এক সঙ্গে লক্ষণ দেখা দেয়, তবে হয়তো তা বাতের কারণে নাও হতে পারে। তবে চিকিৎসা না করা হলে বাত অস্থিসন্ধির যথেষ্ট ক্ষতি করতে এমনকি চলনক্ষমতাও হ্রাস করতে পারে।

প্রতিরোধ

· লিফট বা এস্কেলেটরের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করুন।

· প্রতিদিন সকালে উঠে ৫-১০ মিনিট জোরে হাঁটুন বা জগিং করুন।

· গাড়িতে ওঠার আগে কিংবা লম্বা জার্নির শুরুতে অন্তত ৫০০ মিটার পায়ে হেঁটে নিন।

· ওজন কমানোর দিকে মনোযোগী হোন।

· প্রতিদিন ৬-৮ গ্লাস পানি খান।

· ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার প্রতিদিন পরিমিত পরিমানে খান।

· একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকবেন না। ১৫-২০ মিনিট পর পর খানিকটা হেঁটে নিন।

· ধূমপান ও মদ্যপান হাড়ের ক্যালসিয়াম শুকিয়ে দেয়ার জন্য দায়ী। ধূমপান ও মদ্যপান বন্ধ করুন।

· প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় দুধ রাখুন। যদি 'লাক্টোস ইনটলারেন্ট' হয়ে থাকেন তবে ব্রকলি খান ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পুরনের জন্য।

· প্রতিদিন ব্যায়ামের জন্য অন্তত ১০ মিনিট রাখুন।

· সপ্তাহে অন্তত ২ বার খানিকটা তেল গরম করে নিয়ে হাড়ের জয়েন্টে ম্যাসাজ করুন।

· যারা ব্যথা ভুগছেন তারা আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন গরম তুলা. কাপড় বা পানির সেঁক নিন।

যেকোনো ধরনের ব্যথাতেই জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকা আছে। যাঁদের সন্ধিব্যথা বা বাত আছে, তাঁরা খাবারের বেলায় কিছু সতর্কতা পালন করবেন।

যা খাবেন:

দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার: দুধ, দই ও পনির; অর্থাৎ দুধজাত খাবারে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি থাকে। এগুলো হাড় শক্তিশালী করে।

মাছ: রুই, টুনা ও স্যামন মাছে রয়েছে প্রদাহনাশক ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সপ্তাহে অন্তত ২ দিন ৮৫ থেকে ১১৩ গ্রাম এ ধরনের মাছ খাওয়া প্রয়োজন।

সয়াবিন: সয়াবিনেও রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা প্রদাহ কমায়। তা ছাড়া সয়াবিনে রয়েছে লো ফ্যাট, উচ্চমানের প্রোটিন ও ফাইবার।

বাদাম: ড্রাই ফ্রুট; অর্থাৎ আখরোট, পেস্তা ও কাঠবাদাম—এসবে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিংক, ভিটামিন ই ও ফাইবার। অস্টিওআর্থ্রাইটিস ও আর্থ্রাইটিস—উভয়ের জন্যই এসব বাদাম বেশ উপকারী।

লেবুজাতীয় ফল: কমলালেবু, পাতিলেবু, মুসম্বি ও আঙুরে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি। অস্টিওআর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিয়মিত এসব ফল খেলে ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে অনেকটাই মুক্তি পান। হাড়ের ক্ষতি অনেকটাই কম হয়।

গ্রিন টি: পলিফেনল ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ গ্রিন টি। এটি ব্যথা কমায় ও তরুণাস্থির ক্ষতির মাত্রা কমায়। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে হাড়কে সুরক্ষা দেয়।

ব্রকলি: ব্রকলি অনেক রোগের ক্ষেত্রে খুব ভালো একটি খাবার। উচ্চমানের ভিটামিন রয়েছে এতে। এর মধ্যে সালফোরেফেন নামের একটি উপাদান আছে, যা অস্টিওআর্থ্রাইটিস হওয়ার আশঙ্কা কমায় বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

যা খাবেন না:

টমেটো: টমেটোতে রয়েছে ইউরিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড হাড়ের জোড় বা জয়েন্টে জমা হয়, যা আর্থ্রাইটিসের ব্যথা বাড়ায়।

লাল মাংস: আর্থ্রাইটিসে ফসফরাসসমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। যেমন লাল মাংস (গরু, খাসি)। এতে শরীরে অতিরিক্ত ফসফরাস জমা হয় এবং ক্যালসিয়াম হারিয়ে যায়।

চিনি: হাড়ের জোড়ে ব্যথা থাকলে চিনি খাওয়া ক্ষতিকর। এতে ওজন বাড়ে ও জয়েন্টে চাপ পড়ে।

কফি: কফি শরীরকে পানিশূন্য করে তোলে। এটি আর্থ্রাইটিসের ব্যথা বাড়ায়।

মদ্যপান: অ্যালকোহল হাড়কে ভঙ্গুর করে দেয়। তাই হাড় সুস্থ রাখতে ও আর্থ্রাইটিসের সমস্যা কমাতে মদ্যপান এড়িয়ে চলুন।

এ ছাড়া বেগুন, লাল মরিচ, আলু এগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যালকালোয়েডস। এগুলো প্রদাহ তৈরি করে। তাই হাড়ের জোড়ে ব্যথা থাকলে এগুলো খাবারের তালিকা থেকে বাদ দিন।

ইলেকট্রিক শক

আমাদের সবার বাড়িতেই ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি আছে। এসব চালাতে গিয়ে অসাবধানতায় ইলেকট্রিক শক খাওয়ার ঘটনাও বেড়ে চলছে। তাই ইলেকট্রিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে জানা থাকা খুব জরুরি। একটু সচেতনতা বড় বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে আপনাকে এবং আপনার প্রিয়জনকে।

কেউ ইলেকট্রিক শক খেলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে:

১. কেউ ইলেকট্রিক শক খেলে তাকে ধরা যাবে না। তেমন করলে আক্রান্তকে তো বাঁচাতে পারবেনই না, উল্টো আপনিও একই সঙ্গে শক খাবেন।

২. কেউ শক খেয়েছে বুঝতে পারলে প্রথমেই কারেন্টের সুইচ বন্ধ করুন। যদি সম্ভব না হয় তাহলে শুকনো খবরের কাগজ, উলের কাপড়, শুকনো কাঠের টুকরা অথবা পলিথিন ব্যাগে হাত মুড়িয়ে শক খাওয়া ব্যক্তিকে ধাক্কা দিয়ে ইলেকট্রিক শকের উৎস থেকে আলাদা করে দিন। যদি কিছুতেই কাজ না হয়, তাহলে দ্রুত বৈদ্যুতিক অফিসে খবর দিন।

৩. শক খাওয়া ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে দ্রুত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেয়ার ব্যবস্থা করুন। সাধারণত বলা হয় যে ৩ মিনিটের ভেতর কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা গেলে ১০ জনের ভেতর ৭ জনকে বাঁচানো সম্ভব। দেরি করলে বাঁচানোর সম্ভাবনা কমে আসে। এমন জরুরি মুহূর্তে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার ওপর আক্রান্ত ব্যক্তির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নির্ভর করে। একই সঙ্গে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থাও করুন।

৪. শক খাওয়া ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তার বুকের ওপর জোরে জোরে চাপ দিয়ে হৃৎপিণ্ড চালুর চেষ্টা করুন। এসময় রোগীর মুখ দিয়ে বাতাস প্রবেশ করিয়ে শ্বাস নেয়ার ব্যবস্থা করুন।

৫. শক খাবার পরও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকে তবে খুব বেশি ভয়ের কিছু নেই। রোগীকে শুয়ে থাকতে বলুন। এ সময় একজন ডাক্তারকে খবর দিন অথবা হাসপাতালে নিয়ে যান।

অ্যালার্জি

যাদের অ্যালার্জি আছে, তাদের খুব সাবধানে থাকতে হয়। সামান্য এদিক-সেদিক হলেই শুরু হয়ে যায় চুলকানি, চোখ লাল, ত্বকে লালচে দানা ওঠা ইত্যাদি। অ্যালার্জি আছে এমন অনেকেরই ঘর ঝাড়ামোছা করলেই ত্বকে চুলকানি শুরু হয়ে যায়। আবার কারও কারও ধুলাবালির সংস্পর্শে এলেই ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। কোনো কোনো ওষুধের অ্যালার্জিতে তো জীবন-সংশয়ও দেখা দিতে পারে।

ধুলাবালি ছাড়াও কোনো বস্তুর প্রতি অতি সংবেদনশীলতার কারণেও অ্যালার্জি হতে পারে। যেমন ধাতব অলংকার, প্রসাধনসামগ্রী, কোনো রাসায়নিক, ডিটারজেন্ট, সাবান, পারফিউম, প্লাস্টিকের তৈরি গ্লাভস বা বস্তু, গাছ, ফুলের রেণু, ওষুধ, সিনথেটিক কাপড় ইত্যাদি। এ সমস্যা জন্মগত ও পারিবারিক কারণে হতে পারে। বিশেষ বস্তুতে অ্যালার্জির ক্ষেত্রে ওই বস্তুর সংস্পর্শে এলে শরীরে হিস্টামিন, সেরোটনিন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়। এর ফলে ত্বকে চাকা, ত্বক লাল, চুলকানি, চোখ লাল বা চোখে চুলকানি ইত্যাদি হতে পারে। কারও কারও শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানিও হতে পারে। নাক বন্ধ, নাক দিয়ে পানি পড়ার সমস্যাও থাকতে পারে। তীব্র প্রতিক্রিয়া হলে রোগী অচেতন হয়ে পড়তে পারেন।

অ্যালার্জি থেকে মুক্ত থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, যে বস্তুতে অ্যালার্জি রয়েছে, তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। যেমন, যার ডিটারজেন্ট বা সাবানে অ্যালার্জি, তিনি বাসনকোসন, কাপড়চোপড় ধোয়ার সময় হাতে গ্লাভস পরবেন। যার অলংকারে অ্যালার্জি, তিনি তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবেন। এ ক্ষেত্রে রোগীর যেসব বস্তুতে অ্যালার্জি, সেগুলোর একটি তালিকা করতে পারেন। স্কিন টেস্ট করে এটা বোঝা যায়। কোনো ওষুধে অ্যালার্জি হলে অবশ্যই তার নাম লিখে রাখবেন এবং চিকিৎসককে অবহিত করবেন।

ত্বকে প্রদাহ বা অ্যালার্জি হয়ে গেলে তা কমাতে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিহিস্টামিন, স্টেরয়েড মলম, ক্যালামিন লোশন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন। হঠাৎ লাল হয়ে চুলকানির ক্ষেত্রে ঠান্ডা সেঁক বা ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করলে খানিকটা আরাম পাওয়া যায়। এ সময় বাতাস চলাচল করে এমন পাতলা সুতি কাপড় পরুন। প্রসাধনসামগ্রীতে অ্যালার্জি থাকলে রাসায়নিকযুক্ত প্রসাধনসামগ্রীর ব্যবহার এড়িয়ে চলতে হবে।

ত্বকে র্যাশ বা ফুসকুড়ি

ত্বকের কিছু অংশ লালচে হয়ে গিয়ে চাকা বা গোটার মতো হয়ে যাওয়ার সমস্যাকে ফুসকুড়ি বা র্যাশ বলে। এর সঙ্গে অনেক সময় ত্বকে অস্বস্তি ও চুলকানি হয়ে থাকে। এমন সমস্যায় অনেকে নিজে নিজে বা ওষুধের দোকানদারের পরামর্শে নানা ধরনের মলম লাগিয়ে পরিত্রাণের পথ খোঁজেন, যা একেবারেই ঠিক নয়।
র্যাশ নানা কারণে হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক প্রভৃতির সংক্রমণ কিংবা ধুলাবালু, প্রসাধনী ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রতি অ্যালার্জির কারণে ত্বকে ফুসকুড়ি হতে পারে। এর ধরন, রং, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি দেখে কারণ নির্ণয় করা যায়।

কী করবেন:

* ত্বক লালচে হয়ে গিয়ে চুলকানি হলে অ্যান্টিহিস্টামিনজাতীয় ওষুধ সেবন করা যেতে পারে।
* ত্বকের অস্বস্তি দূর করতে ময়েশ্চারাইজার লাগাতে পারেন।
* সমস্যা দূর না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

যা করবেন না:

ইচ্ছেমতো যেকোনো ওষুধ লাগানো থেকে বিরত থাকুন। স্টেরয়েডজাতীয় মলম লাগানোর ফলে সাময়িক স্বস্তি মিললেও পরে নানা সমস্যা হতে পারে। বেশি বেশি স্টেরয়েড মলম লাগালে ত্বকের স্বাভাবিক পুরুত্ব নষ্ট হওয়া, ত্বকে ভাঁজ পড়া, বেশি ব্রণ হওয়া, অবাঞ্ছিত লোম গজানোর মতো সমস্যার পাশাপাশি শরীরের ওজনও বাড়তে পারে। সংক্রমণের কারণে র্যাশ হলে স্টেরয়েডজাতীয় মলম লাগানো একদমই বারণ। এতে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। মলমে স্টেরয়েডের মাত্রার হেরফের আছে। তাই না বুঝে এগুলো ত্বকে লাগানো ঠিক নয়। অনেকে চুলকানি হলে ছত্রাকরোধী মলম লাগাতে থাকেন। কিন্তু আপনি নিজে র্যাশের কারণ না-ও বুঝতে পারেন। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই নিরাপদ।

চোখে ছানি (Cat ar act)

অনেকেই মনে করেন শুধু বয়স্ক ব্যক্তিদেরই চোখে ছানি পড়ে। এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা অন্যান্য অসুখের কারণে কারও কারও অল্প বয়সেও চোখে ছানি হতে পারে। এমনকি শিশুদেরও হতে পারে। আর জন্মগতভাবে চোখে ছানি নিয়েও জন্মাতে পারে শিশু। তবে ছানি পড়ার ঝুঁকিতে তুলনামূলক বেশি থাকেন বয়স্ক ব্যক্তিরা।

অন্ধত্বের অন্যতম কারণ চোখে ছানি পড়া। ছানি চোখের এমন এক রোগ, যাতে চোখের লেন্স ধীরে ধীরে ঘোলা বা অস্বচ্ছ হতে শুরু করে। চোখের লেন্স ঘোলা হয়ে যাওয়ার এ সমস্যাকে বলে ক্যাটারেক্ট। এ কারণে লেন্সের প্রোটিন বা ক্রিস্টালিনের গঠন নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দৃষ্টিশক্তি কমে আসে।

কেন পড়ে

যেসব কারণে চোখে ছানি পড়তে পারে–

- বার্ধক্যজনিত কারণে;
- দীর্ঘমেয়াদি ডায়াবেটিস;
- ঘন ঘন চোখের প্রদাহ;
- দীর্ঘদিন স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ খাওয়া;
- চোখে আঘাত পাওয়া;
- ধূমপান ও মদ্যপানে আসক্তি এবং
- বংশগত কারণে।

উপসর্গ

- ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া;
- চোখের লেন্সের রং ঘোলা হয়ে আসা;
- আলোতে গেলে চোখ থেকে পানি পড়া;
- রং চিনতে অসুবিধা হওয়া;
- বারবার চশমার পাওয়ার পরিবর্তন হওয়া;
- একই জিনিসকে একের অধিক দেখা;
- আলোর চারদিকে রংধনু দেখা;
- আলোতে চোখ বন্ধ হয়ে আসা ইত্যাদি।

ওষুধ নাকি অস্ত্রোপচার

চোখে ছানির সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা হচ্ছে অস্ত্রোপচার। ওষুধের মাধ্যমে পুরোপুরি ছানি নিরাময় করা সম্ভব নয়।

যেহেতু বয়সজনিত পরিবর্তনের কারণে ছানি রোগ হয়, সেহেতু বয়সজনিত ছানি রোগ প্রতিরোধে তেমন কিছু করার নেই। তবে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস, ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রিত, চোখের প্রদাহের ত্বরিত চিকিৎসা, অনিয়ন্ত্রিত হরমোন জাতীয় ওষুধ ও ধূমপান বর্জনের মাধ্যমে ছানি রোগের সম্ভাবনা কমিয়ে আনা সম্ভব।

কৃমি

কৃমি এক ধরনের পরজীবী। এটি মানবশরীর থেকে পুষ্টি নিয়ে বেঁচে থাকে, বৃদ্ধি পায়, বংশবিস্তার করে। শিশুদের মধ্যে এই পরজীবীর সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৃমির সংক্রমণ বেশি হয়। তবে সতর্ক থাকলে এই পরজীবীর সংক্রমণ মোকাবিলা করা সম্ভব।

শিশুর কৃমির সংক্রমণ কিছু লক্ষণে বোঝা যায়। তবে কোনো কোনো শিশুর কৃমির সংক্রমণে কোনো উপসর্গ থাকে না। এই শিশুরা কৃমির বাহকের ভূমিকা পালন করে। শিশুর কৃমির সংক্রমণজনিত প্রধান লক্ষণগুণো হলো–

পেটব্যথা, পেট ফোলা-ফাঁপা, রক্ত বা রক্তযুক্ত ডায়রিয়া, বমিভাব, বমি, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন কমা, জ্বর, ক্লান্তি, হাত-পায়ের ব্যথা এবং মাথাব্যথা।

কিছু কিছু রোগ-লক্ষণ কৃমির ধরনের ওপর নির্ভরশীল। যেমন

- ✓ প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাব হয় কেঁচো কৃমি,
- ✓ রক্তাল্পতা, ভিটামিন বি-১২ এবং ফলিক অ্যাসিডের অভাব ঘটে বক্র কৃমি ও আন্ত্রিক ফ্লুকসের সংক্রমণে।
- ✓ কেঁচো কৃমি, বক্র কৃমি, আন্ত্রিক ফ্লুকসের সংক্রমণে বদহজম হয়।
- ✓ জিয়ারডিয়াসিস, বক্র কৃমি, ক্রিপটো-স্পোরইডসের সংক্রমণে ওজন কমে যায়।
- ✓ কেঁচো কৃমি অন্ত্রে দলা বা পিণ্ড পাকাতে পারে।
- ✓ যকৃৎ, মাংসপেশি, চোখ, মস্তিষ্ক, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কৃমির সংক্রমণে জন্ডিস, খিঁচুনি, অ্যাজমাসহ নানা রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
- ✓ কৃমি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা নষ্ট করে বলে নানা ধরনের অসুখ এবং ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হতে পারে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

সংক্রমিত ও কৃমির বাহক দ্রুত চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসক প্রথমে রোগীর মল পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট ধরনের কৃমির সংক্রমণ নির্ণয় করেন। এরপর সে অনুযায়ী কৃমিনাশক ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন।

শৌচাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, মল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। শিশুকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

কিছু সতর্কতা

অনেকেই মনে করেন, চিনি বা গুড় খেলে কৃমি হয়। এ ধারণা ভুল। কৃমির সংক্রমণের অন্যতম কারণ হলো অপরিচ্ছন্ন থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা।

কিছু কৃমি মাটি থেকে পায়ের ত্বকের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। তাই শিশুকে নোংরা মাটিতে খালি পায়ে হাঁটতে না দেওয়াই উচিত।

শিশুর খাবার প্রস্তুতকারী ও পরিচর্যাকারীর পরিচ্ছন্নতা জরুরি। একইভাবে জরুরি শৌচাগার ব্যবহারের পর এবং খাওয়ার আগে শিশুর হাত সাবান দিয়ে ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

জলাতঙ্ক রোগ ও সচেতনতা

জলাতঙ্ক র্যা বিস ভাইরাসঘটিত রোগ। কুকুর, শিয়াল, বিড়াল, বাদুড়, বেজি, বানর ইত্যাদি প্রাণী জলাতঙ্ক সৃষ্টিকারী ভাইরাসে আক্রান্ত হলে এবং আক্রান্ত প্রাণীটি সুস্থ মানুষ বা গবাদিপশুকে কামড়ালে ওই মানুষ কিংবা গবাদিপশুও এ রোগে আক্রান্ত হয়। তবে আমাদের দেশে ৯৫ শতাংশ জলাতঙ্ক রোগ হয় কুকুরের কামড়ে।

জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণসমূহ

- ✓ খাওয়াদাওয়ায় অরুচি, বিকৃত আওয়াজ, কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে যাওয়া, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, বিনা প্ররোচনায় অন্যকে আক্রমণ বা কামড় দেওয়ার প্রবণতা।
- ✓ আক্রান্ত ব্যক্তির প্রচণ্ড পানির পিপাসা পেলে ও পানি দেখলেই তিনি আতঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়েন।
- ✓ আলো-বাতাসের সংস্পর্শে এলে এ ভীতি আরও বেড়ে যায়।
- ✓ খাবার খেতেও আক্রান্ত ব্যক্তির কষ্ট হয় এবং খিঁচুনিসহ মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা নিঃসৃত হয়।
- ✓ ক্ষেত্রবিশেষে জলাতঙ্কে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষাঘাত, শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়া, ঝিমুনি হওয়া, ক্ষতস্থানে অবশতা ও অসারতা অনুভূত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণও প্রকাশ পেতে পারে।
- ✓ শরীরের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ু ও মাংসপেশি দুর্বল হয়ে পড়লে আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসকষ্ট দেখা যায়।
- ✓ জলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশের পর রোগীর মৃত্যু অবধারিত।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

- ➢ সাধারণত জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুর, শিয়াল, বিড়াল, বাদুড়, বেজি, বানর ইত্যাদি প্রাণীর কামড় বা আঁচরের ৫ থেকে ৩ মাসের মধ্যে রোগীর শরীরে লক্ষণ প্রকাশ পায়। লক্ষণ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যেই জলাতঙ্কে আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যায়। কোনো অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না। তবে জলাতঙ্কের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকা রয়েছে, যা রোগের লক্ষণ প্রকাশের আগে শরীরে প্রয়োগ করতে পারলে মৃত্যু এড়ানো যায়।

- ➢ কোনো সন্দেহজনক বা অচেনা প্রাণী আঁচড় বা কামড় দিলে শুরুতেই আক্রান্ত স্থানে ক্ষত ও রক্তপাতের তীব্রতা খেয়াল করতে হবে। এ জন্য প্রথমেই ক্ষতস্থান চেপে ধরতে হবে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। এরপর টিউবওয়েল বা কলের প্রবাহমান পানির ধারার নিচে ন্যূনতম ১০-২০ মিনিট ধরে কাপড় কাঁচার সাবান দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করতে হবে।

- ➢ ক্ষত পরিষ্কার হয়ে গেলে দেরি না করে ক্ষত-পরবর্তী সংক্রমণের হার কমানোর জন্য কাছের চিকিৎসাকেন্দ্র যেতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক টিকা ও ইমিউনোগ্লোবিউলিন দিতে হবে।

- ➢ কুকুর বা বিড়াল না কামড়ালেও আগে থেকেই জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া যায়। যারা কুকুর বিড়াল পোষেন বা কুকুর, শিয়াল, বিড়াল, বাদুড়, বেজি, বানর ইত্যাদি প্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন তাদের আগেই জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া জরুরি।
- ➢ গৃহপালিত কুকুর-বিড়ালকে জলাতঙ্কের টিকা দিতে হবে।
- ➢ যেসব প্রাণীর কামড়ে জলাতঙ্ক হয় সেসব প্রাণীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে ও বাচ্চাদেরও দূরে রাখতে হবে।

➢ নিজ এলাকায় কোন প্রাণীর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করলে নিকটস্থ পশু চিকিৎসক/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

কুকুর কামড়ালে যে বিষয়গুলির ব্যাপারে সাবধান থাকা জরুরি

- ✓ কখনোই ক্ষতস্থান কেটে দেওয়া বা শুষে নেওয়া যাবে না।
- ✓ ক্ষতস্থানে বরফ লাগানো যাবে না।
- ✓ ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করা যাবে না।
- ✓ ক্ষতস্থানের উপরে বা নিচে কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে(Tor ni quet) বাঁধা যাবে না।

মনে রাখবেন

- ✓ কুকুর, বিড়াল, শিয়াল, বেঁজি, বানর, বাদুর কামড়ালে জলাতঙ্কের ও টিটেনাস এর টিকা দিতে হবে।
- ✓ ইদুর, খরগোশ, কাঠ বিড়ালী, গুইশাপ এর কামড়ে জলাতঙ্কের টিকার প্রয়োজন নেই।
- ✓ গর্ভাবস্থায়, দুগ্ধদানকারী মায়ের, ছোট বাচ্চা, বৃদ্ধ ও অন্য কোন অসুস্থতায় জলাতঙ্কের টিকা নিরাপদ।

সাপে কাটলে করনীয়

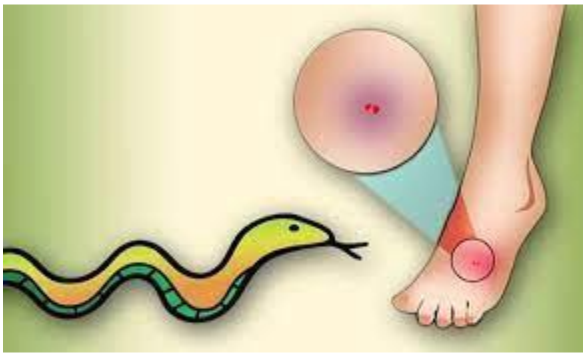

সাপে কাটার সঙ্গে 'আতঙ্ক' শব্দটি জড়িয়ে আছে। গ্রামীণ জীবনে সাপে কাটার বিষয়টি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হলেও মে থেকে অক্টোবর মাসে তা বেড়ে যায়। তবে সাপে কাটলেই যে বিষক্রিয়া হবে, বিষয়টা কিন্তু এমন নয়। অনেকের জানা, দেশে বিষধর সাপের চেয়ে নির্বিষ সাপের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু অপচিকিৎসা ও অজ্ঞতার কারণে আক্রান্ত মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয় না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৯১৯ জন সাপের কামড়ের শিকার হয়। এদের মধ্যে বছরে মারা যায় ৬ হাজার ৪১ জন। আশঙ্কার বিষয় হলো, এর মধ্যে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় মাত্র ৩ শতাংশ মানুষ।

বিষধর সাপে কাটলে শরীরে বিষক্রিয়ার কিছু লক্ষণ দেখা যায়ঃ

- ক্ষতস্থানে বিষদাঁতের দুটি দংশনের চিহ্নের উপস্থিতি,
- ক্ষতস্থান থেকে অনবরত রক্তপাত ও ক্ষতস্থান অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ওঠা এবং প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করা,
- কখনো কখনো সারা শরীর ফুলে যাওয়া,

- খাবার ও ঢোক গিলতে অসুবিধা,
- শ্বাসকষ্ট,
- চোখে ঝাপসা দেখা ও চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসা,
- ঘুম ঘুম ভাব আসা,
- হাত-পা অবশ হয়ে আসা ও অচেতন হয়ে পড়া,
- ঘাড় সোজা রাখতে না পারা,
- প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি।

এ ধরনের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে নিকটস্থ হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত। সাধারণত নির্বিষ সাপের কামড়ে আক্রান্ত স্থানে সামান্য ব্যথা, ফুলে যাওয়া বা অল্প ক্ষত সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে এসব লক্ষণ থাকলেও ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়, যেকোনো রোগীকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। বিষধর সাপের কামড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর মূল কারণ যথাযথ সচেতনতার অভাব। ওঝা বা বেদের মাধ্যমে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে চিকিৎসা করানো এবং রোগীকে হাসপাতালে আনতে বিলম্ব করা। **সাপে কাটা ব্যক্তিকে** প্রথমে আশ্বস্ত করতে হবে যে তার ভয়ের কোনো কারণ নেই। এর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে। বেশির ভাগ সাপই নির্বিষ, এমনকি বিষধর সাপের পক্ষেও দংশনের সময় সব সময় প্রচুর পরিমাণ বিষ ঢেলে দেওয়া সম্ভব হয় না। এ জন্য আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাহস দেওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে দ্রুত নিতে হবে। হাসপাতালে স্থানান্তরের সময় আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাঁটতে না দিয়ে কাঁধে, খাটিয়ায় বা কোনো যানবাহনের সাহায্যে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সম্ভব হলে সাপটি দেখতে কেমন, তা লক্ষ করা। সাপের বর্ণনা চিকিৎসককে চিকিৎসা পরিকল্পনায় সাহায্য করতে পারে।

সাপে কাটা ব্যক্তিকে

- দংশিত স্থান কিছুতেই কাটাছেঁড়া করা উচিত নয়।
- কেবল ভেজা কাপড় দিয়ে কিংবা জীবাণুনাশক মলম দিয়ে ক্ষতস্থান মুছে দিতে হবে।
- আক্রান্ত স্থান থেকে মুখের সাহায্যে রক্ত বা বিষ টেনে বের করার চেষ্টা করা বা ক্ষতস্থানে গোবর, শিমের বিচি, আলকাতরা, লালা, ভেষজ ওষুধ বা কোনো প্রকার রাসায়নিক লাগানো উচিত নয়।
- দংশন করা স্থান থেকে ওপরের দিকে একটি লম্বা কাঠ এবং গামছা বা কাপড় দিয়ে কেবল একটি বাঁধন এমনভাবে দিতে হবে, যেন তা খুব আঁটসাঁট বা ঢিলে কোনোটাই না হয় এবং একটি আঙুল একটু চেষ্টায় বাঁধনের নিচ দিয়ে যেতে পারে। কারণ, খুব বেশি শক্ত করে বাঁধলে আক্রান্ত অঙ্গে রক্ত চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- যেহেতু মাংসপেশির সংকোচনে বিষ দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তাই সাপে কাটার স্থান বেশি নড়াচড়া করা উচিত নয়।
- আক্রান্ত ব্যক্তিকে বমি করানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ কিংবা কানের ভেতর বা চোখের ভেতর কিছু ঢেলে দেওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে।

আশপাশের মানুষের একটু সচেতনতা ও বিজ্ঞানমনস্কতাই সাপে কাটা রোগীর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে অনেকাংশে সাহায্য করবে।

<u>পানিতে ডুবে গেলে করনীয়</u>

আক্রান্ত ব্যাক্তির বয়স ও ওজন কম হলে

- ✓ আক্রান্ত ব্যাক্তিকে চিত করে শুইয়ে দিতে হবে।
- ✓ এক হাত ও এক পা ধরে আক্রান্ত ব্যাক্তিকে উপুর করে দিতে হবে।
- ✓ দুই হাত দিয়ে পেট ধরে টেনে তুলতে হবে।
- ✓ এভাবে আক্রান্ত ব্যাক্তিকে ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে।
- ✓ মুখ দিয়ে পানি বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে তাকে শুইয়ে দিতে হবে।

আক্রান্ত ব্যাক্তির বয়স ও ওজন বেশি হলে

- ✓ আক্রান্ত ব্যাক্তিকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে মুখ একদিকে কাত করে দিতে হবে।
- ✓ আক্রান্ত ব্যাক্তির দুই পা সাহায্যকারীর দুই পায়ের মাঝখানে রাখতে হবে।
- ✓ আক্রান্ত ব্যাক্তির নাভি আর পাঁজরের মাঝখানে সাহায্যকারীর হাতের গোড়াটি রেখে আকস্মিকভাবে জোরে উপর দিকে চাপ দিতে হবে। পানি বের না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চাপ দিতে হবে।
- ✓ দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।